প্রকৃতিপ্রেমিক জয়নুলের ক্যানভাসে মানবতাবাদী জননুলের সুন্দর ও অসুন্দর

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নুল আবেদিনের ছবি আমি প্রথম দেখি একটি মুড়ির ঠোঙার গায়ে। সাদা কালো, দুর্ভিক্ষ সিরিজের একটি ছবি। তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি কি দিইনি, ঠিক মনে নেই। গ্রামে থাকি। কে জয়নুল আবেদিন, তিনি কোন দেশের শিল্পী --- এসব কিছুই জানি না। ছেলেবেলা থেকে ছবির প্রতি একটি আলাদা টান থাকার কারণে এবং চোখে না দেখলেও পাঠ্যপুস্তক থেকে 'দুর্ভিক্ষ' শব্দটির ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকার কারণে সেদিন ঠোঙার গায়ে আমার চোখ আটকে যায়। বই আমায় যা দেয় নি, জয়নুল আবেদিনের ছবি আমায় তা দিয়েছিল। তিনি দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আমাকে খোলাখুলিভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামের জল হাওয়া মাটিতেবেড়ে ওঠার কারণে তাঁর ছবির মানুষগুলো তো আমার খুবই চেনা, তাই সেদিন আমার এই অনুভবে পৌঁছতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নিয়ে, সাধারণ মানুষের জীবনচর্চার মধ্যে নিজেকে কতখানি ডুবিয়ে দিলে তবে হাত দিয়ে এই ধরনের রেখা বেরিয়ে আসে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিনের ছবিই হল শেষ কথা --- আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষ এই একই ধারণা পোষণ করেন।

এই মুহূর্তে জয়নুল আবেদিনের কিছু উক্তি আমার খুব মনে পড়ে যাচ্ছে ---'আমি প্রায় অর্থ শতাব্দী ধরে ছবি আঁকছি, মহৎ শিল্পী হবার আকাঙ্খায় নয়, বরং আমার জীবনকে সুন্দর করার জন্য। আমি কেমন ছবি এঁকেছি জানি না, কিন্তু কেন ছবি আকিঁ তা বলতে পারি। আমি ছবি আঁকি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তুলে ধরার জন্য, জীবনে যা সুন্দর এবং জীবনে যা সুন্দর নয়, তাকেও দেখাবার জন্য, জীবনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় যে শক্তি বিরোধিতা করে তাকেও চিহ্নিত করার জন্য। যে ছবি মানুষকে সুন্দরের দিকে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই হচ্ছে মহৎ ছবি, যে শিল্পী তা পারেন তিনি মহৎ শিল্পী। আমার সারা জীবনের শিল্পসাধনা ও শিল্প আন্দোলনও আমার জীবনকে এবংআমাদের সবার জীবনকে সেই সুন্দরের দিকে নিয়ে যাবার আন্দোলন।'

জয়নুল আবেদিন তাঁর শিল্প - দর্শন ও শিল্পী - জীবন - দর্শন ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল একটি শিল্পকলা নিদর্শন অথবা সামগ্রিকভাবে শিল্পকলা ক্রমাগত একজন মানুষকে সুন্দর জগৎ সৃষ্টির কাজে সাহায্য করবে। মাঝে মাঝে মানুষের ক্ষুদ্রতা দেখে, জীবন দর্শনে অসম্পূর্ণতা দেখে তিনি হয়তো বিচলিত হয়েছেন, হতাশও হয়েছেন কিছুটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মানুষের মৌলিক সততায় এবং শক্তিতে বিশ্বাস রেখেছেন। সৌন্দর্যবোধ ও মানবতাবোধ সম্পন্ন এই শিল্পী ভীষণভাবে চাইতেন প্রকৃতি ও মানুষেরমধ্যে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তুলতে। এই বোধ দ্বারা তিনি আজীবন তাড়িত হয়েছেন। এই বোধ তাঁকে প্রকৃতিপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক এবং মানবপ্রেমিক করেছে। এই বোধই তাঁকে করেছে শিল্পী।

ময়মনসিংহের এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ১৯৩২ সালে জয়নুল আবেদিন একান্তই নিজের চেষ্টায় কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু পড়ার খরচ জোগাবে কে? তখনকার দিনে যারা নিজের পয়সায় পড়তে পারতো না, তাদের অনেকেই জেলা বোর্ডের বৃত্তি পেত। কিন্তু নিয়ম ছিল আর্টস্কুলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট ছাড়া কিছুই হবে না। আবার এই সার্টিফিকেটও একবছর পড়ার পর পরীক্ষা হলে তার ফলের ভিত্তিতে হবে। কিন্তু ওই একবছর তার কলকাতায় চলবে কিভাবে? তখন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুল দে। আর্ট কলেজের ভর্তির পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাত্রটির জন্য মুকুল দে-র মতো কড়া ধাতের মানুষও নিয়ম ভেঙেছিলেন। একবছর পড়ার আগেই তিনি জেলা বোর্ডের বৃত্তির জন্য

সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। মিলেছিল পনের টাকার বৃত্তি।
বৃত্তির ওই সামান্য টাকাতেই তাঁর থাকা - খাওয়া - পড়া এবং ছবি আঁকার হাত ভাল ছিল বলে তিনি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নানারকম সাহায্য পেতেন। ছয় বছরের কোর্সে পাঁচ বছরে পড়তে পড়তেই তাঁকে কলেজের একটি খালি পোস্টের জন্য শিক্ষক নির্বাচিত করা হয়। কোর্স শেষ হওয়ার আগেই অধ্যক্ষ মুকুল দে তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি চান তাহলে ফিফ্‌থ ইয়ারে থাকতেই তাঁকে ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া হবে ---একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি এতটাই পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। জয়নুল আবেদিন অবশ্য এই প্রস্তাবে রাজি হন নি। তিনি সাধারণ নিময়েই কোর্স শেষ করে আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বেরোন ১৯৩৭-৩৮ সালে।
জয়নুল আবেদিন যখন কলকাতার আর্ট কলেজে ভর্তি হন, তখন বাংলাদেশের চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয়তথা ওরিয়েন্টাল আর্টকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন চলছিল। কিন্তু তিনি অবনীন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাবের সময়েও তিনি সেই প্রভাবথেকে মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পচর্চা করে শিল্প বিদ্যালয়ের 'ফাইন - আর্ট' বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। একসময় মুকুল দে-ও তাঁকে ওরিয়েন্টাল আর্টে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় চিত্রাঙ্কন রীতির প্রতি তাঁর মারাত্মক দুর্বলতা ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিসর্গ থেকে ছবি এঁকেছেন। সেই আঁকার রীতি তঁার নিজস্ব এবং বিস্তৃত ইউরোপীয়ান একাডেমিক পদ্ধতির। তাঁর মনে হতএই পদ্ধতিতেই তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, গাছ- পালা, নদী ইত্যাদি ঠিকভাবে দেখাতে পারবেন।
জয়নুল আবেদিনের চিত্রকলার চারটি প্রধান ধারা পাওয়া যায়। প্রথমত, ১৯৩৩ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত একাডেমিক তথা ইম্প্রসনিস্ট, দ্বিতীয়ত, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের উপর আঁকা স্কেচ, সেগুলি খুব প্রকাশবাদী বা এক্সপ্রেশনিস্ট, তৃতীয়ত, ১৯৪৭ - উত্তর বাংলার লোকজ শিল্পধারাভিত্তিক চিত্রকলা এবং বিগত শতাব্দীতে সাত ও আটের দশকে আঁকা বিমূর্ত প্রকাশবাদী চিত্ররীতি।
প্রকৃতির কাছ থেকেই জয়নুল আবেদিন তাঁর প্রথম শৈল্পিক প্রেরণা পেয়েছিলেন। ব্রহ্মপুত্র ছিল তাঁর কাছে এক প্রচণ্ড আকর্ষণ। তিনি নিজে প্রায়ই বলতেন --- "নদীই হল আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।" ছাত্রজীবনে তিনি বেশ কিছু নদী নিসর্গ চিত্র এঁকেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি যে ছবিগুলির জন্য ছোটলাটের স্বর্ণপদক লাভ করেন সেগুলিও ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর আঁকা একগুচ্ছ জলরঙের ছবি। নিসর্গ দৃশ্য তিনি পরিণত বয়সেও এঁকেছিলেন। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময় তিনি ছাত্রদের নিয়ে নৌকায় করে নদীতে বেড়াতে বেরোতেন -- নদীর ছবি আঁকার জন্য।
জয়নুল আবেদিন সারা জীবন ধরে অসংখ্য নিসর্গ চিত্র আঁকলেও চিত্রামোদী মানুষেরা তাঁকে বেশি করে মনে রেখেছে তঁার লোকশিল্প ভিত্তিক ছবিগুলির জন্য, পাশাপাশি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সিরিজের ছবিগুলির জন্যও।
জয়নুল আবেদিন ব্যক্তি ও কর্মজীবনে ছিলেন খুবই সহজ সরল। শিল্পের কত জটিল তত্ত্বকে তিনি কত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর চেতনার অন্তঃসলিলে নিরন্তর প্রবহমান গ্রাম - বাংলার মানুষ আর প্রকৃতিতে অবলীলায় উন্মোচিত করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, তাঁর কর্মে এবং তাঁর চিত্রকলার গ্রামীণ মানুষের জীবন - জিজ্ঞাসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় একেবারেই আলাদা, স্বতন্ত্র। তাই জয়নুল আবেদিন নিঃসন্দেহে একজন আধুনিক শিল্পী বটে, কিন্তু সম্ভবত এর চাইতে বড় পরিচয় -- তিনি একজন সার্থক লোকায়ত শিল্পী, বলা যায় আধুনিক লোকশিল্পী।
বাংলায় মানুষ ও এর ঐতিহ্যগত লোকশিল্পের প্রতি জয়নুল আবেদিনের প্রগাঢ় প্রাণের টান ছিল। তবে জয়নুলের সঙ্গে গ্রামের নাড়ির টান যত প্রবলই হোক না কেন, তিনি ছিলেন শহরকেন্দ্রিক একজন আধুনিক শিল্পী। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য যে, তাঁর জীবন - চেতনা ও শিল্পচৈতন্যে বাংলার লোকশিল্পের মূল সুরটি খুব ভালভাবেই প্রবাহিত ছিল।
জয়নুল আবেদিন মনোপ্রাণে যে কথাটি বিশ্বাস করতেন তা হল, মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই অসাধারণ দক্ষ নিসর্গচিত্রী তবু জয়নুল আবেদিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক অবিস্মরণীয় মানবতাবাদী শিল্পীর আবির্ভাব দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা চিত্রমালা শুধুমাত্র এক নির্লিপ্ত বিজ্ঞান - মনস্ক দলিল প্রস্তুতকারীর কাজ নয় বরং বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া এবং পরিস্থিতির যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া এক মানবপ্রেমিকের আবেগ অনুভূতির শক্তিশালী মূর্ত প্রকাশ

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ছিল শোষণের এক চরম পরিণতি। এরই সঙ্গে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষের জঘন্য আচরণ শিল্পীকে হতাশ করত। কিন্তু তাঁর শিল্পীমন এবং দক্ষ হাতের ছোঁয়া আবার এই নির্মম পরিবেশের বিদ্ধাচরণও করেছিল। এই দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতেগিয়ে তাঁর স্টাইলও বদলে গিয়েছিল। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমি ইম্প্রেশনিস্ট বা এক াডেমিক পদ্ধতিতেই আঁকতাম, তারপরএল সেই ভয়াল দুর্ভিক্ষ। আমি কলকাতার সেই ভয়াবহ দৃশ্যাবলী ধরে রাখতে চ াইলাম। চটপট কাজ করতে হয়, তাছাড়া সব জিনিসের দাম চড়া, আমি সস্তা কাগজে, দ্রুত হাতে অবিরাম এঁকে চললাম, শত শত স্কেচ, দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন দৃশ্যের; প্রয়োজনের তাগিদে, নেহাৎ অবস্থার প্রয়োজনে আমার স্টাইল বদলে গেল, এক্সপ্রেসনিস্ট হতে বাধ্য হলাম, খুব সহজ অথচ শক্ত রেখায় কিছুটা জ্যামিতিক, আকৃতির মধ্যে সেইসব দৃশ্য ধরে রাখতে চ াইলাম।'

গত শতকের শু থেকেই এদেশের আধুনিক শিল্পীদের কাছে আধুনিকতার দ্যোতক হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য শিল্পের কয়েকটি বিশেষ আঙ্গিক। অনেকের কাছে আঙ্গিক সর্বস্বতাই শিল্পের পরাকাষ্ঠা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। চল্লিশের দশকে তথ াকথিত আধুনিকতার উন্মাদনা যখন প্রায় চরমে ওঠে, তখন এই ধারার বাইরে থেকে অনেকটা একভাবে গুটিকয়েক শিল্পী সমকালীন জীবন ও জ্বলন্ত বিষয়কে শিল্পের বিষয় করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। যেমন, চিত্তপ্রসাদ, সূর্য রায়, সোমনাথ হোড় এবং জয়নুল আবেদিন। দুর্ভিক্ষের সময়ে কলকাতার রাজপথে গ্রাম - বাংলার অনাহারী মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের এক মহাকাব্যিক চিত্র রচনা করেছিলেন। এই শিল্পীরা। তবে জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীদের অবশ্যই কিছুটা তফাৎ রয়েছে। চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়েরা কম্যুনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী, শিল্পে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সমামা জিক দায়বদ্ধতার চিহ্ হিসাবে ছবিগুলি এঁকেছিলেন। কিন্তু জয়নুল আবেদিনের ক্ষেত্রে কোন দার্শনিক ভূমিকা ছিল না বলেই আমার মনে হয়। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি ছিল একটি বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্পীর হাতে আঁকা রোজনামচ ার মতো। খাবারের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষগুলোর প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার সংগ্রামেই তিনি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু ছবিগুলো মানুষের স্মৃতি ও সত্তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলির গঠনশৈলীর দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাব, শিল্পী তাঁর দুর্ভিক্ষের ছবিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনুষ্য অবয়বে চোখ স্পষ্ট করতেন না। এর দুটি কারণ আছে । প্রথমটি সম্পূর্ণ ব্য াকরণগত। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের চোখ কোটরাগত বোঝাবার জন্য যেভাবে আলোছায়ার প্রয়োগ করতে হয়, তাতে চে াখের জায়গায় কেবল ঘন বর্ণ প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়টি হল, চোখের মধ্যে দিয়েই মানুষের আত্মপরিচয়, আশা - আক াঙ্খা ইত্যাদি ফুটে ওঠে। কিন্তু শিল্পী যাদের ছবি আঁকছেন তাদের চোখে তো তখন শুধুই অন্ধকার। প্রথম ক্ষেত্রে ঘন বর্ণের প্রয়োগ এক অর্থে যান্ত্রিক আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর বোধজ্ঞান। যেহেতু শিল্পীর বোধজ্ঞান এই প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত, তাই সেখানে জয়নুল আবেদিন চোখের জায়গায় কেবলকালোছাপ দিয়ে রেখেছেন। সেই না আঁকা চোখও ছবির মানুষগুলোর মনের ভাব ও আর্তি প্রতিফলিত করেছে।

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যদি আমরা জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি দেখি তাহলে তখনকার সেই বিশেষ সময়ে মানুষের দারিদ্র্য ও অসহায়তার পাশাপাশি তাদের সংগ্রামটাও আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দুর্ভিক্ষের কথা জানে না এমনদর্শকের কাছে আজ এই দারিদ্র্যের কারণ অজানা থাকবে কিন্তু দারিদ্র্যের বার্তা তার কাছে পৌছে য াবেই। ছবিগুলি পরপর দেখলে আজ এও বোঝা যাবে যে কোন আর্থ - সামাজিক কারণেই হোক না কেন, এই সময়ে এদেশের মানুষ নিদাণ দারিদ্র্যের কবলে পড়েছিল। কারণ প্রত্যেকটি ছবিতেই অঙ্কন সময়ের উল্লেখ আছে।

জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিতে মানুষ প্রায় যতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ততখানিই করে কাক । ছবিতে কাক সিম্বল হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং কয়েকটি ভূমিকা পালন করেছে। কোন ছবিতে কাক নিঃসঙ্গতার পরিবেশ গড়তে সাহায্য করেছে, কোন ছবিতে সেই একই প্রাণী মানুষের জান্তব অস্তিত্ব অর্থাৎ নিছকই বেঁচে থাকার আর্তিকে পরিস্ফুট করেছে। অ াবার কোন ছবিতে কাক সুযোগসন্ধানী, কুচক্রী, মতলববাজ মানুষ রূপেও উপস্থাপিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের ছবিগুলিতে ব্যবহ ৃত রেখা কৌণিক, নিটোল নয়। রেখার এই ধর্মই চিত্রিত মানুষগুলির জীবনের ইঙ্গিতবাহী। এই ছবিগুলিতে চিত্রিত অবয়বগুলির কোনটিই একটি পরিষ্কার রেখায় ঘেরা নয়। রঙের ছোপ ছায়া প্রয়োগের জন্যই দেওয়া হয়েছে ঠিক কিন্তু সেই দেওয়ার মধ্যে একধরনের অগোছালো ভাব আছে। জলরঙ করার সময় প্রায় শুকনো তুলিতে রঙ নিয়ে ঘষলে যেমন

হয় ঠিক সেইরকম। প্রত্যেকটি ছবি গাঢ় রঙ প্রয়োগের একই রীতি অনুসৃত হয়েছেদেখে একটা ইচ্ছাকৃত ভাবা অযৌক্তিক নয়। এই অবয়বগুলিতে যে ক্ষতা ও অগোছোলো ভাব এসেছে তা চিহ্নিত মানুষগুলির জীবনসম্পর্কে কিছু বলে, যা শুধু তথ্য নির্ভর নয়, অনুভূতি নির্ভরও বটে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ছাড়াও, ১৯৬৯ -এর বাঙালির গণ - আন্দোলন, ১৯৭০-এর মনপুরার জলোচ্ছ্বাস, ১৯৭১ -এর স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা ১৯৪৭-এর অকাল, সর্বদাই আবেদিনের মন, প্রাণ ও তুলি সেবকের তথা বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭০ সালে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ যখন প্রাণ হারায় তখন তিনি দুঃখে, ক্ষোভে জর্জরিত হন। স্তূপাকার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়, 'আমরা বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হই এভাবে শুধু মৃত্যুতেই।' দুর্ভিক্ষ, জলোচ্ছ্বাস ছাড়া জয়নুল আবেদিনের যে সকল ছবিঅবিস্মরণীয় তার বেশিরভাগই অবশ্য সাধারণ গ্রামীণ বাংলার জীবনের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে গ্রামবাংলার মাঝি - মাল্লা, চাষা - ভূষার সান্নিধ্য বেড়ে ওঠা জয়নুল আবেদিন নগরে বসবাস করেও নাগরিকহয়ে উঠতে পারেন নি। প্রমিত ভাষায় কথা বলেন নি কখনেও। নিঃসঙ্কোচে একান্ত আঞ্চলিক উচচারণে প্রকাশ করেছেন নিজের কথা।নাগরিক জয়নুলের চিত্রকলার সেইজন্যই হয়তো নগরের অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর। খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শু করে, গ্রাম - বাংলার আলো ঝলমলে উজ্জ্বল নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁর চিত্রকলার প্রধান উপজীব্য। তাই দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী কলকাতার রাজপথে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলোকে কোন আদর্শের চশমায় অবলোকন করেন নি। পরমাত্মীয়ের শঙ্কিত দৃষ্টি, অসহায় মানুষের বেদনা খুঁজে নিয়েছে।

জয়নুল আবেদিন বাংলার কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রথম থেকেই খুব সহজ সরল অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যময় অঙ্কনভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। অতি সাধারণ কাগজ, কালো কালি আর তুলি। এতেই তিনি দুর্ভিক্ষের অসাধারণ স্কেচগুলো এঁকে ফেলেন। বাঙালির জীবনের সামান্যতা এর চেয়ে প্রবলভাবে হয়তো আরও কোন মাধ্যমে কিংবা ফর্মে দেখানো সম্ভব নয়। তাঁর ড্রইং কঠিন অথচ অত্যন্ত গতিময়, বাঙময়। কম্পোজিশনে জ্যামিতিকতা আছে, একাধিক ত্রিভুজের সমন্বয়ে যেন এক একটি মানুষের দেহ নিমিত, এতে তীক্ষ্নতা আরও বেড়েছে। এক আশর্চ্য আবিষ্কারের মতো এই অঙ্কনভঙ্গি, আঙ্গিক বা ফর্ম তাঁর হাতে এসে যায়।

বিগত শতাব্দীতে সাত ও আটের দশকে জয়নুল আবেদিন বিমূর্ত প্রকাশবাদী চিত্ররীতিকে মাধ্যম করে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। নিজের এই বিশেষ ধারা নির্বাচন নিয়ে শিল্পী একবার বলেছিলেন, "...বৃটিশ রাজত্ব শেষ হল। পাকিস্তানে এলাম --- পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। বাঙালির ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতির জন্য সবার যে আন্দোলন, সম্ভবত তারই প্রভাব পড়লো অবচেতনভাবে আমারও মনে, বাঙালির লোকজ শিল্পরীতিকে তুলে ধরতে হবে, পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করার একটা বিদ্রোহ হিসাবেই রচিত হল আমার একটি চিত্র পর্যায় এবং সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে এইসব শক্তি কাজকরেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিগত দশকে যখন মনে হত যে ওরা আর আমাদের সংস্কৃতিকে চেপে রাখতে পারবে না, তখন যেন কিছুটা মুক্ত কিছু বিমূর্ত প্রকাশবাদী ছবি আমিও এঁকেছি, অন্যান্যরা বিশেষ করে তণরা যেমন এঁকেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই রীতি আমার জন্য নয়। আমার চিত্র, প্রকৃতি ও মানবনির্ভর, বিষয় - নির্ভর এবং আমার ছবির উৎপত্তি এবং রঙের পেছনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অঙ্কনধারা, লোকজ রীতিগুলো বেশি উৎসাহ যোগায়।'

জয়নুল আবেদিনের শিল্পদর্শনের মানবকেন্দ্রিকতা বা আরও বিশিষ্টভাবে সংগ্রামী সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর একাত্মতা, নিঃসন্দেহে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর শিল্পদর্শন তথা জীবনদর্শনে আরও যে বিশিষ্টতা ছিল, যেমন তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে সংস্কারহীন এবং সেকুলার এক শিল্পী ও ব্যক্তি। বাঙালি জাতিসত্তার জন্য বাংলাদেশে আন্দোলন তাতেও জয়নুল আবেদিন বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। লোকশিল্পের চারিত্র সংরক্ষণের জন্য তথা আধুনিক শিল্পকলায় ও আধুনিক - জীবনে এর সমন্বয় সাধনের জন্য জয়নুল আবেদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ ছবি বাস্তবতার চিত্রই শুধু নয়, বাঙালির তথা শ্রমজীবী দরিদ্র মানবগোষ্ঠীর জীববেন অন্তহীন সংগ্রামের প্রতীকও বটে। 'জয়নুল' শব্দের অর্থ হল সুন্দর। তাই জয়নুল আবেদিন বাঙালির চেতনায় সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। জয়নুল আবেদিন বলতে জীবনে, কর্ম, মননে, মেধায় এক সার্থকনামা আধুনিক শিল্পীর প্রতিচ্ছবিই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com